খ্রীষ্টান জামাতি !

VIRUS - "Like an inert chemical it can hang for decades without loosing any of its virulence. But whenever subjected to a living cell it springs up to life with all of its cruel efficiency".

বুশ আবার অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। মুসলমানদের ওপরে অ্যামেরিকান সরকারের খড়্গাহস্ত রূদ্রমূর্তিতে সেখানকার মুসলমানরা আতংকিত। গত সপ্তাহে ক্যানাডিয়ান রেডিওতে শুনলাম, এক সপ্তহে ক্যানাডার ইমিগ্রেশনের ওয়েবসাইটে হিট পড়েছে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজারের মত (প্রথমে লিখেছিলাম "আবেদন পড়েছে" - এক পাঠক ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ)। তার মধ্যে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজারই এসেছে অ্যামেরিকা থেকে। এর বড় অংশ মুসলমান হতে পারে, অ্যামেরিকার মুসলমানরা বোধহয় এখন ক্যানাডায় আসার চেষ্টা করছে। যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তেমন অনেক অমুসলিম অ্যামেরিকানও খুব আতংকিত হয়ে পড়েছেন অ্যামেরিকার সংসদে খ্রীষ্টান জামাতিদের অদৃশ্য অনুপ্রবেশে।

বহু শতাব্দী ধরে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোর নিষ্ঠুর অত্যাচারে অগণিত নিরপরাধের আর্তনাদ হাহাকারে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে মানুষের ইতিহাস। সময়ের দাবীতে সেগুলোকে সংসদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছে পৃথিবীর বিবেকবান মানুষ, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির হয়েছে বিশ্ব-বিজয়। পদ্ধতিটা সবেমাত্র বিশ্ব-মানবের আস্থা অর্জন করতে শুরু করেছিল, কিন্তু লখিন্দর-বেহুলার লোহার ঘরের দেয়ালে অজানা ছোট্ট ফুটোর মতন গণতন্ত্রের লুকোন ফাঁক দিয়ে এখন বুশ-ব্লেয়ারের কালনাগ ঢুকে পড়েছে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ওপরে অনেকেরই আস্থা গেছে টলে। এখন সমাজ-বিজ্ঞানীদের আর বিবেকবান রাজনীতিকদের হাড়ে-হাড্ডিতে দূর্বাঘাস গজিয়ে যাবে ত্রুটি মেরামত করে পদ্ধতিটার ওপরে বিশ্ব-মানবের আস্থা ফিরিয়ে আনতে। হতে পারে "আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ-ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র", এই জাতিয় কিছু প্রস্তাব করবেন তাঁরা। এমনিতে আইনের বিশ্বায়নে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে বিশ্ব-বিবেক, হল্যান্ডে আন্তর্জাতিক ক্রিমিন্যাল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যদিও হাসিনার আমলে আমাদের হতচ্ছাড়া সরকার তাতে প্রাথমিক সইটা করলেও আখেরে র‍্যাটিফিকেশনটা আর করেন নি। গুবলেট আর বলে কাকে।

কিন্তু "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী"? এখন ধর্মরাষ্ট্রের দর্শন ফিরে আসছে আবার বিভিন্ন চেহারায়। এর বাহক-বেরাদররা কম ধুরন্ধর নয়, একেবারে যেন ভাইরাস। অনেকেই খেয়াল করেন না, খ্রীষ্টান জামাতের স্বপ্ন "বহু বৎসর ধরিয়া নিরীহ বস্তুর মত পড়িয়া" থাকার পর সম্প্রতি লাফ দিয়ে প্রাণবন্ত চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সে খুবই বোঝে যে "ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকিকরণ" এখন এতই স্বীকৃত যে ওর বিরুদ্ধে খোলাখুলি কথা বললে পৃথিবীর মানুষ তার পশ্চাদ্দেশে ডান্ডাপেটা করার জন্য তাড়া করবে। তাই বিভিন্ন ছদ্মবেশে ওই "ধর্ম-রাষ্ট্রের পৃথকিকরণ"-এর ভেতর দিয়েই "ধর্ম-রাষ্ট্রের একত্রিকরণ"-এর চাল চালছে এই মহা-চাণক্য বকধার্মিক।

১৯১০ -১৯১৫ সালে "দি ফান্ডামেন্টাল" নামে খ্রীষ্টান ধর্মের ধর্মের পাঁচটা মৌলিক বিধান লিখে তার প্রায় তিরিশ লক্ষ কপি বিরতণ করে প্রিনষ্টন এলাকার এক গীর্জা। "ফান্ডামেন্টালিষ্ট" শব্দটার প্রথম প্রয়োগ আমরা দেখি তখনই। এর অনুসারীরা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে নির্বাচনে জিততে শুরু করে এবং ১৯২৫ সালে টেনেসি প্রদেশে নির্বাচনে একেবারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায়। এই খ্রীষ্টান জামাতিরা সংসদে বসে

প্রথমেই যে অপকর্মটা করে তা হল, আইন করে স্কুলে ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ানো বন্ধ করা। মনে আছে, এ বছরই আমাদের সম্প্রতি পাকিস্তান-প্রদেশের জামাতি সংসদের কথা? সংসদে বসেই "ইসলামের মূল্যবোধ রক্ষার খাতিরে" তাঁরা আইন বানালেন, ই-সি-জি আর আলট্রাসাউন্ডের পুরুষ টেকনিশিয়ানের কাছে মহিলা রোগীরা যেতে পারবেন না। অথচ সারা প্রদেশে ই-সি-জি'র পুরুষ টেকনিশিয়ান আছে মাত্র এক জন, আলট্রাসাউন্ডের কেউই নেই। ওখানকার মা-বোনদের কষ্ট অনুভব করার ভারটা আমি আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।

শারিয়ার বিশাল ইতিহাসে ভারতের শাহবানু মামলার মতই খ্রীষ্টান জামাতির ইতিহাসে টেনেসি'র এই স্কুল-আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনের বিরুদ্ধে জন স্কোপ্‌স্ নামে ডারউইন-বাদী এক মুক্তমনা শিক্ষক ক্ষেপে গিয়ে মামলা ঠুকে দিলেন আদালতে। ব্যাস, সারা দেশে পড়ে গেল হুলুস্থুল, খবরের কাগজ আর রেডিয়ো-টিভিতে শুরু হল মারমুখী কুরুক্ষেত্র। কারণ দু'পক্ষই বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিল যে এ মামলা শুধু মামলা-ই নয়, এর রায়ে অ্যামেরিকার রাষ্ট্র-দর্শনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। মামলাটাকে পাদ্রীরা বললেন স্রষ্টা ও বিজ্ঞানের লড়াই হিসেবে (""contest between God and Science")। স্কোপ্‌স্-এর পক্ষে আদালতে নেতৃত্ব দিলেন অ্যামেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের ক্ল্যারেনস ড্যারো, বিপক্ষে নেতৃত্ব দিলেন বিখ্যাত পাদ্রী জেনিংস ব্রায়ান। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে জয়ী হবার জন্য পাদ্রীদের স্রষ্টাকে মানুষের আদালতের শরণাপন্ন হতে হল।

এবং সে আদালত স্রষ্টাকে নিরাশ করলেন না। ভারতের আদালত প্রথমে মোল্লাদের হারিয়ে দিলেও পরে জিতিয়ে দিয়েছিল, শেষ পর্য্যন্ত আবারও হেরে গিয়েছিলেন চিরকালের পরাজিত মুসলিম নারী শাহ বানু। অ্যামেরিকান আদালতের রায়েও হেরে গেলেন মুক্তমনা শিক্ষক জন স্কোপ্‌স্, বাইবেলের কাছে হেরে গেলেন ডারউইন। খ্রীষ্টান জামাতিরা বিজয়ী হয়ে মেতে উঠলেন উৎসবে।

কিন্তু আদালতের রায়ের প্রতি ধিক্কারে ধিক্কারে বন্যার বেগে ছুটে এল সমাজ-কল্যাণের অতন্দ্র প্রহরী জাগ্রত জনতা, সুশীল নাগরিক সমাজ আর সংবাদপত্রগুলো। স্কোপ্‌স্-এর উকিল ড্যারো বিখ্যাত হয়ে উঠলেন যুক্তিভিত্তিক চিন্তাধারার মহানায়ক হিসেবে ("Darrow emerged as the hero of rational thought"). মানবতা ও যুক্তির সেই প্রবল বন্যার সামনে পাদ্রীর দল কচ্ছপের মত মাথা ঢুকিয়ে নিল খোলসের ভেতর, উল্কাবেগে অদৃশ্য হল দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি থেকে। কিন্তু অদৃশ্য হল চিরকালের জন্য নয়, শুধু মাহেন্দ্রক্ষনের অপেক্ষায়। কারণ, - "নিজের ক্ষতিকর ক্ষমতা কিছুমাত্র না হারাইয়া ইহা বহু বৎসর ধরিয়া নিরীহ বস্তুর মত (ভেটকি মারিয়া) পড়িয়া থাকিতে পারে"।

১৯২৫ সালের কথা সেটা।

ঠিক দু'বছর পরই, ১৯২৭ সালে গর্ত থেকে চুপি চুপি মাথাচাঁড়া দিয়ে চারদিক দেখে নিল ভাইরাসটা। তারপর নিজেদের চেষ্টায় বানাল বব জোনস্ বিশ্ববিদ্যালয়, ঠিক যেমন "নিজেদের পয়সায়" (আসলে প্রধানতঃ মধ্যপ্রাচ্যের পয়সায়) হাজার হাজার মাদ্রাসার বানাবার বন্যা বইছে বাংলাদেশে। এতে প্রকান্ড কিছু সুবিধে আছে। সেগুলো হল, সরকারের পয়সা নিতে হয়না বলে সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়না, সরকারী ইনস্পেক্টরও আসে না খোঁচাখুঁচি করতে বা ঘুষ খেতে। তাতে ছাত্রগুলোকে ইসলামের নামে হিংস্রতা শেখানো যায়, হুকুম মাফিক "শহীদ" হবার আবেগে হাজার হাজার জিহাদি নামানো যায় রাস্তায়, "ইসলাম রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য" কোরাণের নামে শেখানো যায় বন্দুক চালানো।

বব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও গলা দিয়া গুঁতিয়ে গেলানো হল বাইবেল। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে সারা দেশ তাকে পাত্তা দিলনা বটে, কিন্তু সে পাত্তার পরোয়া সে করেও নি। চুপি চুপি সে বানাতে থাকল শত শত খ্রিষ্টান অন্ধ-বিশ্বাসী, অপেক্ষায় থাকল সুযোগের। এভাবে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকলে আল্লা শেষমেষ বোধহয় বিরক্ত হয়েই ‘‘ছাপ্পর ফাইড়া’’ দান করেন। দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধের হট্টগোলে মানুষের মন-মগজ যখন যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের দিকে, তখন ১৯৪২ সালে আবার চুপি চুপি মঞ্চে আবির্ভুত হল ইতিহাসের এই খলনায়ক বিভিন্ন মুখোসে, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাভেঞ্জেলিক্যালস্, ন্যাশনাল কাউনসিল অফ চার্চেস, লিবার‍্যাল ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অফ চার্চেস ইত্যাদি হরেক নামে। আমাদের যেমন জামাতে ইসলামি, নেজামে ইসলামি, ইসলামি ঐক্যজোট, ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলন, হারকাতুল জিহাদ, আল্ কায়েদা বাংলাদেশ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু নামে বিভিন্ন হলেও ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রের মাস্তুতো ভাইগুলোর সব পেঁয়াজের এক গোড়া। এতদিন তারা ঘুরে ঘুরে জনগণের মধ্যে ধর্মীয় ব্যবস্থা প্রচার করত। ১৯৫০ সালে বাজারে টেলিভিশন আসবার সাথে সাথে এই সব অ্যাভেঞ্জেলিষ্ট-রা চট করে হয়ে গেল টেলিভ্যাঞ্জেলিষ্ট, টেলিভিশনের পর্দায় নামলেন বিখ্যাত পাদ্রীর দল, - বিলি গ্রাহাম, রেক্স হামবার্ড, অরাল রবার্টস, ইত্যাদি। শুরু হল সকালবেলার প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট মুভমেন্ট অর্থাৎ ‘‘নাস্তারাধনা আন্দোলন’’। সে আন্দোলনে স্রষ্টা কতটুকু আন্দোলিত হলেন তা বোঝা গেলনা, কিন্তু প্রবলবেগে আন্দোলিত হলেন রাজনীতিকেরা। বিশ্বাসীদের ভোট পাবার দরকারটা তো আর স্রষ্টার নেই, ওটা রাজনীতিকের দরকার। ট্রয়ের ঘোড়ার ভেতরে লুকোন সৈন্যদলের মত নাস্তার ভেতরে লুকোন ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্র ঢুকতে থাকল রক্তে একটু একটু করে ......ক্রমাগত..... প্রতিদিন.........., - আমাদের জামাতিদের মত তাদেরও লক্ষ্য ওই একই, রাজনৈতিক ক্ষমতা। শেষ পর্য্যন্ত অ্যামেরিকার রাজনৈতিক আকাশে অশুভ গ্রহণের মত বিলি গ্রাহাম উদিত হলেন খোদ অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্টদের বৈধ ও আনুষ্ঠানিক ঐশী মন্ত্রনাদাতা হিসেবে।

লক্ষ মানুষের শতাব্দী সংগ্রামে অর্জিত ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকিকরণের দর্শন প্রচন্ড থাপ্পড় খেল নিঃশব্দে, ধর্মনিরপেক্ষ সংসদের দুই গালে রক্তাক্ত হয়ে ফুটে উঠল বাইবেলের পাঁচ আঙ্গুলের দাগ।

আবার চলল মানবাধিকারের দড়ি টানাটানি। গর্ভপাত একেবারেই একটা নারী-সমস্যা। তাদেরই মাতৃত্ব, তাদেরই শরীর, তাদেরই মরণ-বাঁচন। মানবাধিকারের চেয়ে অনেক বেশী এটা নারী-অধিকার, অথচ চিরকালই ওতে পুরুষের উটকো মাতব্বরির অন্ত নেই। যখন বিষয়টাকে নারী-অধিকার হিসেবে ১৯৭৩ সালে স্বীকৃতি দিলেন দেশের সুপ্রীম কোর্ট, খ্রীষ্টান জামাতিদের মাথায় ভেঙ্গে পড়ল আকাশ। সে হৈ হৈ এখনো চলছে, ধীরে ধীরে তাদের নেতৃত্বে উঠে এসেছেন পাদ্রী জেরি ফলওয়েল, জিম এবং টামি বেকার। গর্ভপাত, সমকামি বিয়ে আর ভ্রূণ-গবেষণাকে মূলধন করে এরা দেশের রাজনীতির ওপরে প্রভাব ফেলার প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। সফলও হচ্ছে।

আর, - অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্টের হোয়াইট হাউস?

সেও নতজানু, তারও অনু-পরমাণুতে ছড়িয়ে পড়েছে বিষ। মধ্যপ্রাচ্য-আক্রমণে প্রেসিডেন্ট নির্দেশ পাচ্ছেন খোদ গড-এর কাছ থেকে, অ্যামেরিকান রাজনীতিতে বার বার ফিরে ফিরে আসছে খ্রীষ্টান-ধর্মীয় কথাবার্তার রাহুগ্রাস। গঠনতন্ত্রে ‘‘ইন গড উই ট্রাষ্ট’’ ঘোষনায় দলিত হচ্ছে নাস্তিক আর সংশয়বাদীদের নাগরিক অধিকার, গঠনতন্ত্রে উপাসনালয়গুলোর সম্পত্তি-কর মাফ করে দেওয়াতে হাজার হাজার উপাসনালয়ের লক্ষ লক্ষ ডলার সম্পত্তি-কর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকার। বহু ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-পানির আয় থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে সরকার, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্ম-পালনকারী হয়ে পড়েছে সরকার।

শুরুটা দেখালাম শুধু, বাকি অংশ সবার জানা কারণ চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে ঘটনা। মানবাধিকার সচেতন শত শত লেখক লিখে চলেছেন হাজার হাজার নিবন্ধ। হিন্দু-খ্রীষ্টান বা ইসলামি, - কোন জামাতই ঐতিহাসিকভাবে কোনদিন যুক্তি ও মানবতার ডাকে সাড়া দেয়নি, বিনা যুদ্ধে সুচ্যগ্র মেদিনী ছেড়ে দেয় নি। তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি?

সময়ই বলে দেবে সেটা।

ধন্যবাদ।

ফতেমোল্লা
০৭ নভেম্বর ৩৪ মুক্তিসন (২০০৪ সাল)